তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শক্তিতে বলীয়ান সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ যদি আমরা গড়ে তুলতে চাই তাহলে শিক্ষা, সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস আর পরিকল্পনার জোরে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিভাগে আমরা এই এগিয়ে যাওয়ার গল্পগুলোকেই তুলে ধরছি। এ বিভাগটিকে আপনারা কেমন দেখতে চান, কি করলে আরো ভাল হবে তা জানিয়ে আমাদের ইমেইল অথবা টেলিফোন করুন, চিঠি দিন, সশরীরে হাজির হয়ে পরামর্শ দিন। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নযাত্রায় সবাইকে স্বাগতম। ই-মেইলঃ digitalbd@cnewsvoice.com

বাজেট ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

মোস্তাফা জব্বার

(এই লেখাটি যখন ছাপা হবে তখন বাজেট পাশ হয়ে যেতে পারে। ফলে বাজেটের বেশ কিছু বিষয় হয়ত বদলে যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে আইসিটি খাতে খুব বেশি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। কারণ যে ইস্যুগুলো আমি আলোচনা করেছি সেগুলোর বদলানোর সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও বাজেট পাশের সময় যদি কোনো পরিবর্তন ঘটে যায় তবে তার সাথে সঙ্গতি রেখেই নিবন্ধটি পাঠ করবেন - লেখক)

জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথমবারের মত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজেট পেশ করার জন্য সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মুহিত সাহেবের নিজের কথাতেই আছে যে, তার বাজেট পেশের ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছেন তিনি আর কেউ নন - খোদ প্রধানমন্ত্রী। আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি বলেই প্রধানমন্ত্রী যে সংসদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে থাকবেন সেটি কেউ ঘোষণা না করলেও আমি স্থিরভাবেই বিশ্বাস করি। সেজন্য অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকেও অভিনন্দন। দেশের অগ্রগতিতে তিনি একটির পর একটি মাইলফলক স্থাপন করছেন বলেই আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।

আশির কোঠায় বয়স নিয়ে অর্থমন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে দেখিয়ে দিলেন যে, বয়সের জন্য প্রযুক্তি কোনো বাধা নয়। তার চাইতে এক-দুই যুগ যাদের কম বয়স তারা তার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারেন যে, আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করি বলেই যে কোনো বয়সেই আমাদেরকে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে পারতে হবে।

একই সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার এবং তার কর্মী বাহিনীকে, যারা সংসদে এমন একটি যুগের সূচনা করলেন। সংসদের ভেতরে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্রিন এবং কম্পিউটার ব্যবহার করার ব্যাপারটাই প্রমাণ করে যে, এই সরকার কেবল মুখে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেনি - বরং সরকারের কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি অঙ্গীকারের নাম। অবশ্য তারপরও আমি এতে খুব আনন্দিত নই এজন্য যে, আমাদের সাংসদরা সকলে আশির কোঠায় যার বয়স সেই আব্দুল মাল আব্দুল মুহিত হতে পারলেন না। জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে আমি আবারও এই প্রস্তাব রাখছি যে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পক্ষ থেকে আমরা বিনামূল্যে সংসদ সদস্যদের সকলকে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী। তারা যেন অনুগ্রহ করে এই প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেন-তবেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

এবার আসা যাক বাজেটের সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে। অর্থমন্ত্রী তার ভাষণে দুটি অধ্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছেন। অধ্যায় দুটি হচ্ছে: টেলিকম খাত এবং বিজ্ঞান ও আইসিটি খাত। তবে তার আগে ভাষণের শুরুতেই তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বোঝায় সেই বিষয়ে গতবারের বাজেটে দেয়া বক্তব্যটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে সেই বাংলাদেশ পরিচিত হবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে।"

বস্তুত এই সংজ্ঞাটি নিয়ে সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে থাকে। এদিকে সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের 'অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন সেল' ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে একটু অন্য সুরে কথা বলে থাকে। আমার নিজের কাছে আবার ডিজিটাল বাংলাদেশের সংজ্ঞা আরেকটু ভিন্ন ধরনের। আমি বিষয়টিকে অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের চাইতে আরেকটু বড় ক্যানভাসের বিষয় হিসেবে দেখতে চাই। তিনি যেমনটি বলছেন, তার সাথে আমার মূল বক্তব্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু আমি ক্যানভাসটা ছোট রাখতে চাই না। আমার মতে, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ যা সকল প্রকারের বৈষম্যহীন, প্রকৃতপক্ষেই সম্পূর্ণভাবে জনগণের রাষ্ট্র, এবং যার মুখ্য চালিকাশক্তি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। এটি বাঙ্গালীর উন্নত জীবনের প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। এটি বাংলাদেশের সকল মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর প্রকৃষ্ট পন্থা। এটি একাত্তরের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপকল্প। এটি বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত বা দরিদ্র দেশ থেকে সমৃদ্ধ ও ধনী দেশে রূপান্তরের জন্য মাথাপিছু আয় বা জাতীয় আয় বাড়ানোর অঙ্গীকার। এটি বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সোপান।'

এই সোপানে পৌছানোর জন্য অর্থমন্ত্রী এবার তার বাজেটে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির একটি রোডম্যাপ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'আমরা বলেছি ২০১৪ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সাল নাগাদ তা ১০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই।' আমি মনে করি, এই লক্ষ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদেরকে যদি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হয় যেটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯-এর অন্যতম লক্ষ্য, তবে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

তিনি আরেকটি বড় ধরনের টার্গেট দিয়ে আমাদেরকে একটি বড় আশা দেখিয়েছেন। তিনি বাজেট বক্তৃতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি রোডম্যাপ দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রীর ভাষায় সেই রোডম্যাপ অনুসারে, 'আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বমোট ৯৪২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়েছি।' তিনি কোন বছরে কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন সেটিও উলে-খ করেন; ২০১০ সালে ৭৯২ মেগাওয়াট, ২০১১ সালে ৯২০ মেগাওয়াট, ২০১ সালে ২২৬৯ মেগাওয়াট, ২০১৩ সালে ১৬৭৫ মেগাওয়াট, ২০১৪ সালে ১১৭০ মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ২৬০০ মেগাওয়াট। কামনা করি সেই রোডম্যাপ বাস্তবায়নে তার সরকার সফল হোক - কারণ

বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা কোনোভাবেই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারব না।

এরপর তিনি টেলিকম খাতের প্রসঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার ষান্মাষিক বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনে বলেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রকাশ করে জাতিকে যে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছেন, জাতি আজ তার সুযোগ্য নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন পূরণে ব্রতী হয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার মতে আমরা গত বাজেটে জনগণের ইন্টারনেট ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা বাড়ানো এবং সেবার মূল্য কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলাম। আমরা দাবি করতে পারি যে, আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা বহুলাংশে সফল।'

দেশের পার্বত্য জেলাগুলোসহ সকল উপজেলাকে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসাসহ ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা আমরা করেছি। আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলাকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনার কাজও অনেকখানি এগিয়েছে। যেসব উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ আছে সেখানে ডায়ালআপ ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। দেশব্যাপী ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রতিশ্রুত অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য Next Generation Network (NGN)-ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০টি উপজেলাকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দ্রুতগতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রদানের জন্য ২টি WiMAX লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৪ হাজার ৪০৯টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনকে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগের আওতার মধ্যে আনা হবে। অল্প সময়ের মধ্যে সারাদেশে এক কোটি ল্যান্ডফোন সংযোগ প্রদান ও দেশের ৮ হাজার গ্রামীণ ডাকঘরকে পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টারে রূপান্তরের প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।'

অন্য একটি অনুচ্ছেদে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে দেশে টেলিডেনসিটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এ টেলিডেনসিটি প্রতি ১০০-তে ৩৮ জনে উন্নীত হয়েছে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতি ১০০ তে ৬ জনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, গত বাজেটে আমাদের আরেকটি অঙ্গীকার ছিল দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করা। নতুন এ সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপনের জন্য লাইসেন্সিং নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর ওপর জনগণের মতামত আহবান করা হয়েছে।'

অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্য বিষয়ে আমরা একদিকে আশার আলো দেখি। অন্যদিকে মনে হয় মন্ত্রণালয় থেকে কিছু গৎবাঁধা কথা দিয়েই অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতাকে সাজানো হয়েছে। কারণ প্রতিটি উপজেলায় ইন্টারনেট পৌঁছানোর ব্যাপারটা আমাদের বোধগম্য নয়। কারণ এখন বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ জনগণ মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের আওতায় আছে। এর মানে ৯৮ ভাগ মানুষ ইন্টারনেটের আওতায়ও আছে। আমি ধারণা করি, অর্থমন্ত্রী আমাদের জাতীয় লক্ষ্যের কথাটি বলেননি, বরং বিটিসিএল-এর কথা বলেছেন। এ কারণে আসলে আমাদের কাভারেজ নিয়ে আগ্রহ নেই। অর্থমন্ত্রী খুব অল্প সময়ের মাঝে প্রায় ১ কোটি ল্যান্ড ফোন কানেকশন দেবার কথা বলেছেন, যেখানে বছরের পর বছর গেলেও আমরা ১০ লাখের বেশি ল্যান্ড ফোন সংযোগ দিতে পারিনি, সেখানে অল্প সময়ে ১ কোটি ল্যান্ড ফোন কানেকশন কিভাবে দেয়া হবে সেই বিষয়টি খুবই পরিষ্কারভাবে বলা উচিত ছিল। যদি কাজটি বিটিসিএল করবে বলে মনে করা হয় তবে আমার সন্দেহ আছে যে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হবে কি না।

আমি অবাক হয়েছি, তিনি কেন থ্রিজি লাইসেন্সের কথা বলেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখনই কিন্তু আমরা থ্রিজি লাইসেন্স খুব শীঘ্রি দেয়া হবে বলে শুনেছিলাম। সেই সরকার যাবার পর ১৭ মাস গেল - কিন্তু অর্থমন্ত্রী সেই লাইসেন্স প্রদানের কথা বললেন না। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রীর কাছে আমরা ২০০ উপজেলায় নয় বরং পুরো দেশে ব্রডব্যান্ড কানেকশনের কথা শুনতে চেয়েছিলাম। সরকার জনগণের কাছে ব্রডব্যান্ড পৌঁছানোর জন্য কী কাজ করবে সেই কথাগুলো আমরা শুনতে চেয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম যে, অর্থমন্ত্রী ব্রডব্যান্ড ব্যান্ডউইথের দাম কমাবেন। সরকার আইজিডব্-ুকে নাকি মাত্র ৩৫০০ টাকায় ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ দেয় এবং আইজিডব্-ুগুলো নাকি সেটি ১৮ হাজার টাকায় বিক্রি করে। এই দর নাকি বিটিআরসির দেয়া। এই চরম বৈষম্য বা মুনাফাখোরী কেন হচ্ছে সেটি আমরা জানি না। একই সাথে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করার বিষয়টি প্রত্যাশা করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম যে, তিনি ই-কমার্সকে আয়কর মুক্ত করবেন। কিন্তু ঘটনাটি হয়েছে উল্টো। তিনি ই-কমার্সের ওপর ভ্যাট আরোপ করেছেন। যে বিষয়টি কেবল জন্ম নিয়েছে এবং এক যুগ যাবত যেটি চালু করার জন্য আমরা লড়াই করেছি সেখানে ভ্যাট আদায় করার সিদ্ধান্ত নেয়া প্রায় বিপরীত ধারণার কাজ করা।

টেলিকম খাতে এর বাইরেরও আরও কিছু কাজ ছিল। মোবাইলের ওপর থেকে উচ্চ কর তুলে নেয়া, সিম কার্ডের ওপর থেকে কর তুলে নেয়া এবং নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতিকে শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত করাটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পক্ষে অনুকূল সিদ্ধান্ত হতে পারত।

অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় কার্যত এই খাতে তেমন কোনো নতুন আশার আলো বা বৈপ-বিক কোনো পরিবর্তনের কথা বলেননি। অনেক আলোচনা ও দাবী দাওয়ার পরও ইন্টারনেটের সকল পর্যায়ে ভ্যাট বহাল রয়েছে। সিম কার্ডের কর বা মোবাইল হ্যান্ডসেটের কর আগের জায়গাতেই রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ-এর দাম কমেনি। বরং শুনছি, আমরা দেশের মানুষের জন্য ইন্টারনেটে ব্যবহারের দিকে না তাকিয়ে আমাদের ব্যান্ডউইথ আমরা রপ্তানী করব। এবারও কম্পিউটারের শুল্ক শূন্যের কোঠায় নেয়া হয়নি। নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতিকেও কম্পিউটারের শুল্কের কোঠায় আনা হয়নি। এরই মাঝে টেলিকম খাতে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে। সরকার টেলিকম আইনের সংশোধনী সংসদে উপস্থাপন করেছে এবং আইনটি নিয়ে অনেক দিনের আলোচনা আরো জোরালো হয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন, এই আইনটি পাস হলে সেটি এই খাতকে ধ্বংস করার একটি আইনে পরিণত হবে। এর জন্য সংসদীয় কমিটি ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং সাধারণভাবে এই খাতের মোবাইল অপারেটররা দারুণভাবে তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

বিষয়গুলো বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, বেসিস ও আইএসপিএবি একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে জনগণকে অবহিত করেছে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে কেন্দ্র করেও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। এবার আমরা এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করব। অর্থমন্ত্রীর ভাষায়, **'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশ,** ১৩৩। আমি গত বাজেট বক্তৃতায় ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশের ৭টি বিভাগে উপজেলা পর্যায়ে মোট ১ হাজার ২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ৬টি মেট্রোপলিটন শহরের ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ের ১ হাজার ২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।'

২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার এই অঙ্গীকারের জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ও ঋণী। গতবারই তিনি এই অঙ্গীকার করে আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। একে আমি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করি। এই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য একটি বড় ভিত রচনা করা হবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোনো প্রক্রিয়া বিগত অর্থবছরে দৃশ্যমান হয়নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এটি মনে রাখতে হবে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষার জন্য তাকে ৩২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই

শিক্ষাদানের উপযোগী করতে হবে। এর জন্য কম্পিউটার ল্যাব প্রয়োজন হবে এবং এই শিক্ষা দেবার মত উপযুক্ত শিক্ষক থাকতে হবে। কাজটি চুটকি বাজিয়ে করা যাবে না।

তিনি তার বাজেট ভাষণে জানিয়েছেন যে, এই লক্ষ্যে গত বছর ১৪০০ স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা জানি, ৫টি করে কম্পিউটার দিয়ে এসব ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। দেশের প্রায় সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কম করে হলেও প্রায় শ' খানেক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এই ছাত্র-ছাত্রীরা মাত্র পাঁচটি কম্পিউটার দিয়ে বিষয়টি অধ্যয়ন করবে সেটি আমার কাছে খুব বাস্তবসসম্মত মনে হয় না। তবুও একে 'নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল' বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই কানা মামাই কি সকলে পাবে? ৩২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব গড়ে তোলার কাজটি কি এতই সহজ?

সেজন্য প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে চললে কি আমরা ২০১৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারব? বছরে মাত্র ১৪০০ কম্পিউটার ল্যাব, যাতে মাত্র পাঁচটি করে কম্পিউটার আছে-তা দিয়ে কি ২০১৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব? ২০১০-১১ সালে এই খাতে আলাদাভাবে কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো দায়িত্ব পালন করছে না। গত বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কম্পিউটার শিক্ষার জন্য কোনো কাজও করেনি। স্কুলগুলোকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্যও কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ের মত একটি বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ দানের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রস্তুত করা ছেলের হাতের মোয়া নয়। গত বছর অর্থমন্ত্রী বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ১০০ কোটি টাকার যে থোক বরাদ্দ দিয়েছিলেন সরকার সেই টাকা দিয়েই এই ল্যাবগুলো করেছে। মোট ১৮টি প্রকল্পের একটি ছিল এই ল্যাবগুলো। তার বাজেট বক্তৃতার ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'আইসিটি খাতের উন্ননের জন্য গত অর্থ বছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। উক্ত অর্থ হতে ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী অর্থবছরেও আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একইসাথে আইটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান সমমূলধন তহবিলে আরো ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।' আমার নিজের কাছে এটি একটি বিরাট প্রশ্ন যে, শিক্ষা খাতের কম্পিউটার বিতরণের টাকা আইসিটি খাতের থোক বরাদ্দ থেকে কেন করতে হচ্ছে। সরকার সরাসরি শিক্ষা খাতের জন্যই কেন আলাদা টাকা বরাদ্দ করছে না। যদি তাই হত তবে আইসিটি খাতের থোক বরাদ্দ শিক্ষার বাইরের আইসিটি খাতে ব্যয় করা যেত।

অর্থমন্ত্রী গতবারের ১০০ কোটি টাকার বিপরীতে এবার এ ১১২ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ করেছেন। কার্যত এই খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। গতবারের বাজেটের ১০ কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়নি বলে এবার সেটি ১১২ কোটি টাকা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে এবার না হয় ১৪০০-এর বদলে ২০০০ স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব করা যাবে। প্রায় ৩২ হাজারের মাঝে ১৪০০ বা ২০০০ কে কি সাফল্য বলা যায়? এর আগে বিগত খালেদা জিয়ার সরকার প্রায় ১৭ হাজার কম্পিউটার বিতরণ করলেও সেগুলো এখন আর কার্যকর নেই। বলা যায় যে, সেগুলোর বিনিয়োগ পানিতে গেছে।

অন্যদিকে এসব কম্পিউটারের সাথে আধেয় পাঠ্যবিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমরা যাকে কনটেন্ট বলি তা তৈরির কোনো সরকারি উদ্যোগের খবরও আমার জানা নেই। সরকারের এনসিটিবি নামক প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি চালু করেছে বটে - কিন্তু তার প্রতি যে যথাযথ নজর দেয়া হয়নি সেটিও অত্যন্ত স্পষ্ট। এজন্যই কেবলমাত্র হার্ডওয়্যার দিয়ে কম্পিউটার শেখানোর কাজটি কতোটা করা যাবে তাতে অবশ্যই প্রশ্ন রয়ে গেছে। ফলে কম্পিউটারগুলোর প্রকৃত ব্যবহার এখনও প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

শুধু কম্পিউটার ল্যাবের কথাই বা কেন বলি। কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষকের কী হবে? ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত পুরো দেশের নবম দশম শ্রেণীর মাত্র ৫ হাজার শিক্ষক কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছে। নট্রামস নামক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট কিনে তারা শিক্ষক হয়েছে। কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের অনেক অধ্যায় তারা পড়াতে পাওে না। নট্রামসের সিলেবাসে এসব বিষয় ছিল না। মাত্র দুই মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে শিক্ষক বানানো হয়। এর মাঝে বিষয়টির সিলেবাস বদলেছে। সেই নতুন সিলেবাস বিষয়ে ওরা কিছুই জানে না। অন্যদিকে বাকি প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন সার্টিফিকেটধারী শিক্ষকও নেই। সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টি কারা পড়াবে সেটি সম্ভবত কেউ জানে না। এই বিষয়ে সরকারের কোনো দিক নির্দেশনাও নেই। নীতিমালারও কোনো বালাই নেই। প্রসঙ্গত এটি বলা দরকার যে, সরকারিভাবে কম্পিউটার শিক্ষকের আলাদা কোনো পদও এখন পর্যন্ত অনুমোদিত নেই। কিভাবে এই শিক্ষকদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে তারও কোনো নীতিমালা নেই। এবারের বাজেটে শিক্ষক তৈরির জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আমি ঠিক জানি না, এই কাজটি কিভাবে করা সম্ভব হবে।

এমন একটি অবস্থায় অর্থমন্ত্রীর আশাবাদকে বাস্তবসম্মত বলতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরের সকলকে কম্পিউটার শিক্ষা দিতে পারবেন কিনা সেটি নিয়ে একেবারে বড় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি।

তিনি আরও একটি অনুচ্ছেদে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে কথা বলেছেন। তার ভাষায়, '১৩৫। বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির যে অঙ্গীকার আমি করেছিলাম তার ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ পুনঃপ্রবর্তন আমরা করেছি। ২০১৪ সালের মধ্যে ৪ হাজার কম্পিউটার প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরির লক্ষ্যে দেশের ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপে-ামা কোর্স ও প্রত্যাশিত সংখ্যক প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরির জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় ICT Capacity Development Company নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।'

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ বিষয়ে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই। ফলে সেই বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারবোনা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আইসিডিসি নামক কোম্পানিটি বছরের পর বছর ধরেও আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এটি নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় ১৩৪ অনুচ্ছেদে বলেছেন, 'আমাদের আরেকটি অঙ্গীকার, ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ন্যান্স এ উত্তরণের লক্ষ্যে আমাদেরই প্রণীত ICT Road Map বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ই-গভর্ন্যান্স এর সুষ্ঠু এবং সফল বাস্তবায়নের নিমিত্তে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলাসমুহকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স সূচনার জন্য **'ডিজিটাল স্বাক্ষর'** প্রবর্তনের নিমিত্তে প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authority, CCA) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফাইলভিত্তিক প্রশাসনকে ডিজিটাল প্রশাসনে রূপান্তরের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরে **'ডিজিটাল পদ্ধতির নথি ব্যবস্থাপনা'** চালু করা হয়েছে।"

এটি অবশ্যই প্রশংসার যে সরকার বাংলা গভ নেটও ইনফোবাহন নামক দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সরকারি ও স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলোকে সরাসরি যুক্ত করার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে আরো জানাতে পারতেন যে, ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি কোরিয়ার সাথে সরকারের একটি চুক্তি হয়েছে এবং তার ফলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে ডিজিটাল সরকার পরিচালনার প্রক্রিয়াটি দুই বছরের মধ্যেই শুরু হবে। তবে অর্থমন্ত্রী ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার যে রোড ম্যাপের কথা বলেছেন

সেটি আমরা এখনও খুঁজে পাইনি। তার ভাষণে যে ২০১২ সালের মাঝে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকার পরিচালনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে সেজন্যও ধন্যবাদ। কিন্তু কাজটি যে সহজ নয় এবং এজন্য বর্তমানের কাজের গতি যে এজন্য বহুগুণ বাড়াতে হবে সেটি যদি সরকারের নীতি নির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীরা অনুভব করেন তবে অর্থমন্ত্রী তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবেন। নইলে ২০১২ সালে অর্থমন্ত্রীকে জাতির কাছে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবার সময় চাইতে হবে। যাহোক, আমি কিন্তু বাজেটে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা খাতে মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ দেখতে পাইনি। সেজন্যই রোডম্যাপ থাকলেও সেটি বাস্তবায়ন কেমন করে হবে সেটি বুঝতে পারছি না।'

অর্থমন্ত্রী তার ভাষণের ১৩৬ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন, "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে ইতোমধ্যে **'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯'** অনুমোদিত হয়েছে। এ নীতিমালায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মিলিয়ে মোট ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হবে তা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথকে প্রশস্ত করবে।

আমি এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সাথে একমত যে তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী সেই নীতিমালার আর্থিক অংশটুকু যেমন এই শিল্পের জন্য আলাদাভাবে ৭০০ কোটি টাকার বরাদ্দ এবং এডিপির পাঁচ ভাগ ও জিডিপির ২ ভাগ বরাদ্দের কথা তিনি ভুলেই আছেন। আমি ঠিক বুঝি না, অর্থ বরাদ্দ না থাকলে কর্মপরিকল্পনা কেমন করে বাস্তবায়ন হবে। বাজেটে কেবলমাত্র ১১২ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রেখে ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার যে পূরণ করা সম্ভব নয়, সেটি অর্থমন্ত্রীকে বুঝতে হবে।

অর্থমন্ত্রী ১৩৭ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন, "দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উন্নয়নেও আমরা গুরুত্ব প্রদান করেছি। সে লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে **'হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা'** ও ঢাকার মহাখালীতে **'আইসিটি ভিলেজ'** স্থাপনের পদক্ষেপ আমরা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি। অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি-বৈষম্য কমিয়ে আনতে দেশের ১৩৩টি উপজেলায় **'কমিউনিটি ই-সেন্টার'** আমরা স্থাপন করেছি। এসব সেন্টারের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির সেবায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, উপ- আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে Connectivity প্রতিষ্ঠাকল্পে South Asian Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Information Highway প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী হয়ত অবহিত নন যে, কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য চারদলীয় জোট সরকারের স্থবিরতা কাটিয়ে মহাজোট সরকার বেশ কিছু অবকাঠামোগত কাজ করলেও সেখানে এখনও কোনো শিল্প-কারখানা স্থাপনের মত অবস্থা তৈরী হয়নি। ওখানে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ নেই। নেই ডাটা কানেকটিভিটি। সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাগৈতেহাসিক। বস্তুত সকল সুবিধাদির অনুপস্থিতির পাশাপাশি এখনও হাইটেক পার্কে জায়গা-দালান বা সুবিধা বরাদ্দ দেবার নীতিমালাও তৈরী হয়নি। হয়তো ১০-১১ অর্থ বছরে হাইটেক পার্কের অবকাঠামোগত আরো কিছু কাজ হবে- কিন্তু এই সময়ে এটি চালু হবে কি না সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এই কথাটিও জানানো দরকার যে, মহাখালীর ৪৭ একর জায়গায় আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। সেখান থেকে বস্তি উচ্ছেদ করার জন্য গত আঠারো মাসে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি এবং অচিরেই নেয়া হবে তেমন কোনো লক্ষ্মণও দেখা যাচ্ছে না। চারদলীয় জোট বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেমন এ বিষয়ে নীরব ছিল, বর্তমান সরকারও এই বিষয়ে তেমনই নীরব। এই অংশটি অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে বাদ থাকলেই ভাল হত। কারণ এটি বাস্তবায়নের কোনো পথই আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

তার বাজেট বক্তৃতার ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "আইটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান সমমূলধন তহবিলে আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।" শহীদ কিবরিয়া সাহেবের তৈরী করা এই তহবিলটি এখনও কোনো কার্যকর অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়নি। চারদলীয় জোট আমলে এটি একটি লুটপাটের হাতিয়ার ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এটির কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এই সরকার আসার পর গত ১৮ মাসে প্রায় তিরিশ কোটি টাকা এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু নীতিমালার দুর্বলতার জন্য নতুন আবেদন আসছে না বা এখনও কেউ এই খাতের কোনো টাকা ব্যবহার করতে পারেনি। আমরা বারবার এই খাতের বরাদ্দ যাতে যথাযথভাবে দেয়া যায় সেজন্য অর্থমন্ত্রীর দপ্তরকে যথোপযুক্ত নীতিমালা তৈরীর অনুরোধ করে আসছি। কিন্তু সেটি কোনোভাবেই কার্যকর হচ্ছে না।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণের ২২৭ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন, 'ভূমি ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কর্তৃক অর্জিত সফলতার কথা আমি আমার গত বাজেট বাস্তবায়নের ষান্মাষিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে এ মহান সংসদকে অবহিত করেছি। আমি বলেছি, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এদেশে একটি ডিজিটাইজেশন ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, যার মধ্য দিয়ে আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের চলমান অচলায়তন ভেঙ্গে তা আধুনিকায়ন করতে পারি।' কিন্তু বাস্তবে ডিজিটাল ভূমিব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং ডেমরা ও মানিকগঞ্জসহ যেসব জায়গায় সাফল্যজনকভাবে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে সেখানেও ডিজিটাল ভূমিব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

তবে অর্থমন্ত্রী তার নিজের মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, রাজস্ব, শুল্ক, কর ইত্যাদি খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন। অন্য কোনো জায়গাতে যদি কিছুটা বিলম্বও হয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো যদি সক্রিয়ভাবে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার দিকে পা বাড়ায় তবে দেশের ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়া অনেকটাই দ্রুত এগিয়ে যাবে। অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতার নানা অংশে সেইসব বিষয় উলে-খ করেছেন। যেমন ২৪৭ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, "সরকারি ব্যয়সহ সকল কর্মকাে স্বচ্ছতার জন্য আমরা টেন্ডার প্রক্রিয়াটি অনলাইনে করার উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া, খেলাপি সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে পুনঃতফসিলিকরণ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনোভাবেই মূলধন বেহাত না হয় সে বিষয়টিতে দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখেছি। আশা করি, এ সকল কার্যক্রম বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমাবে।" অনলাইন টেন্ডারের মাধ্যমে আমরা টেন্ডারবাজি শব্দটি থেকে বের হতে পারবো বলে আমরা এর অতি দ্রুত বাস্তবায়ন চাই। তিনি ২৬১ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন, মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে **'মূল্য ঘোষণা'** পদ্ধতি **মূসক ব্যবস্থার সংস্কার** এবং বিভিন্ন উপায়ে কর পরিশোধের সুবিধা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব করছি। একই সঙ্গে ইলেকট্রনিক কমার্সের আওতায় সেবার আমদানিকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

আমার নিজের কাছে প্রচণ্ড বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে অর্থমন্ত্রী ই-কমার্সের মত একটি নবজাত শিশুকে হত্যা করার জন্য এর ওপর ভ্যাট আরোপ করলেন কেন? ৩রা জুন ২১০ যেখানে ই-পেমেন্ট গেটওয়ে চালু হলো মাত্র, সেখানে তিনি দুনিয়ার বহমান ধারার বিরুদ্ধে ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত নিলেন কার পরামর্শে, সেটি আমরা জানি না। তবে আমি মনে করি এটি একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এবং আশা করি যে, তিনি বাজেট পাশ হবার সময় সেটি প্রত্যাহার করবেন।

আমি ২৫৯ নং অনুচ্ছেদে অর্থমন্ত্রী ভ্যাট বিষয়ে যে ঘোষণা দিয়েছেন তাকে স্বাগত জানাই। তিনি এতে বলেছেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজ করার লক্ষ্যে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন এবং দাখিলপত্র

দাখিলের পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সফটওয়্যার (Bangladesh VAT System, eVAT) ব্যবহার করা হবে।

একই সাথে ২৬০ নং অনুচ্ছেদে শুল্কায়ন ডিজিটাইজ করার যে পদক্ষেপের কথা তিনি বলেছেন তাকেও আমি স্বাগত জানাই। এই অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, "বর্তমানে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অটোমেশন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সকল কাস্টম হাউসে পর্যাপ্ত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থল শুল্ক স্টেশনেও ASYCUDA++ সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। শীঘ্রই নতুন জনবল নিয়োগ সম্ভব করা গেলে শুল্ক বিভাগে লোক সংকটের নিরসনসহ গুণগত উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। সংশি-ষ্ট সকলের নিবিড় মনিটরিং ও কর্মতৎপরতার ফলে আগামী অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা আদায় করা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।" অনেক দিন ধরেই রাজস্ব বিভাগ আসিকুডা++ ব্যবহারের চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত যে এমন একটি অটোমেশন কাজ বাস্তবায়ন করতে পারছে তার জন্য ধন্যবাদ। অর্থমন্ত্রী তার ভাষণে প্রশংসা করার মত আরো বলেন, 'টিআইএন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য National ID সংশি-ষ্ট ডাটাবেজ এর সাথে ই-সংযোগের মাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ; আগামী বছরের মধ্যে অন্তত ঢাকার আয়কর অফিসসমূহ automate করা হবে। ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিল পরীক্ষামূলকভাবে একটি কর অঞ্চলে চালু করা হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে সীমিত আকারে ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হবে; করদাতারা যাতে তাঁদের আয়করের হিসাব সহজে করতে পারেন সেজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইটে tax calculator সফটওয়্যার সংযোজন করা হবে।"

সার্বিকভাবে এই বাজেট বিষয়ে তেমন বড় ধরনের সমালোচনার সুযোগ নেই। আমরা প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকেও তেমন কোনো সমালোচনা করতে দেখিনি। এমনকি ডিজিটাল বাংলাদেশ বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত নিয়ে যেসব কথা আমি বলেছি, বিএনপি সেইসব কথাও বলেনি। হতে পারে যে, এই খাতের চুলচেরা বিশে-ষণ করার ক্ষমতাই এ দলটির নেই। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি সরকারকে তার করণীয় বিষয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে না পারে তবে দেশের সামনে চলাটা একপায়ে হাঁটার মত হয়ে যায়। সেজন্যই সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির প্রণেতা ও সমর্থক হিসেবে বাজেটে আইসিটি খাতে সরকারের আরো কিছু করণীয় বিষয়ে কিছু দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রসঙ্গ আমি আলোচনা করেছি। একটি দেশের বাজেট হচ্ছে সেদেশের সকল খাতের সমন্বয় দিয়ে দেশটাকে সামনে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় সরকার আন্তরিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও আইসিটি খাতক আরও গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লড়াইটাকে আরও জোরদার করা যেত বলে আমার ধারণা। ■

লেখক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান-সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর প্রণেতা ॥
ই-মেইল ঃ mustafajabbar@gmail.com,
ওয়েবপেজ: www.bijoyekushe.net

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক স্কুল ও কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর এ বিষয়ে অনেকগুলো কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে সরকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির সুফলকে পৌঁছে দেয়া। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, যারা ভবিষ্যতের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাণ্ডারি হবে তাদেরকে যদি তথ্য প্রযুক্তির আলোয় আলোকিত করা না যায় তাহলে প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। এ কারণেই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের প্রযুক্তির আলোয় আলোকিত করার মহৎ উদ্দেশ্য থেকে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প তথা ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে সংশি-ষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া এসব ল্যাবে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ল্যাবটিকে স্থানীয় জনগণের জন্য ইন্টারনেট অ্যাকসেস সেন্টার হিসেবে ব্যবহারেরও সুযোগ করে দেয়া হবে। যেসব শর্তের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মনোনয়ন করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই সরকারি অথবা সরকারের এমপিও ভুক্ত হতে হবে;

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই পাকা/সেমিপাকা কক্ষ থাকতে হবে;

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে;

৪. বিগত ৩ (তিন) বছরে মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হতে হবে;

৫. স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাড়াও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জনগনের প্রশিক্ষণ/ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে;

৬. তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় জনগণকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করতে হবে;

৭. কম্পিউটার ল্যাবের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে

মোঃ মাহফুজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

প্রশ্ন: এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আপনারা কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

উত্তর: আমরা তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই সুন্দরভাবে প্রকল্পের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কেউ কেউ ট্রাবলশ্যুটিং-এ দক্ষ না হওয়ায় মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর সহকারী প্রোগ্রামাররা এসব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রশ্ন: প্রকল্পটি নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

উত্তর: সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ক্রমাগতই এ প্রকল্পের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করে চলেছি। আগামী বছর আরো বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

প্রশ্ন: প্রকল্পটিকে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাছাই প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের নীতি অনুসরণ করছেন?

উত্তর: তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এর আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের কাজটি করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট সূচক অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষভাবে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে এ প্রকল্পের সুফলভোগী হতে পারে সেজন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

নির্ধারিত ফি আদায় করা যেতে পারে। আদায়যোগ্য ফি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

৮. প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার/বিজ্ঞান শিক্ষক ল্যাবের ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন;

৯. অফিস সময়ের অতিরিক্ত ল্যাব পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা প্রাপ্য হবেন।

মনোনয়ন প্রক্রিয়া

উপজেলাসমূহের আয়তন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, অনগ্রসরতা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিটি উপজেলা থেকে অনুর্ধ্ব ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

একইভাবে মেট্রোপলিটন এলাকার ওয়ার্ডের আয়তন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, অনগ্রসরতা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী ঢাকা বিভাগে অনুর্ধ ৮০টি, চট্টগ্রামে ৩০টি, খুলনায় ২০টি, সিলেটে ২০টি, বরিশালে ১৫টি, রাজশাহীতে ২০টি এবং নবগঠিত রংপুর বিভাগের রংপুর পৌর এলাকার অনূর্ধ্ব ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন দেয়ার জন্য সংশি-ষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণকে অনুরোধ করা হয়। মেট্রোপলিটন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারগণকে জেলা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কমিটির সভাপতি (জেলা প্রশাসক) এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যগণের (জেলা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কমিটির উপদেষ্টা) সহযোগিতা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

কম্পিউটার সামগ্রী

উপজেলা পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটিতে যেসব সামগ্রীর সমন্বয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

কম্পিউটার	৫
প্রিন্টার	১
ইউপিএস	৫
ইউএসবি মোবাইল/ইন্টারনেট মোডেম	২
কম্পিউটার চেয়ার-টেবিল	৫ জোড়া

অন্যদিকে মেট্রোপলিটন এলাকায় যেসব সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

কম্পিউটার	১১
প্রিন্টার	১
ইউপিএস	৬
ইউএসবি মোবাইল/ইন্টারনেট মোডেম	৫
কম্পিউটার টেবিল	৬
কম্পিউটার চেয়ার-টেবিল	১১ জোড়া

উলে-খ্য, প্রাথমিকভাবে এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ১৪০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা থাকলেও লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে মোট ১৬১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের ২০টি বৃহত্তর জেলায় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে নিবাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটার শিক্ষকদের সঙ্গে অবহিতকরণের সভা আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিচালক, উপ-পরিচালক (সিস্টেমস/প্রশিক্ষণ), সচিব এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ধরনের অবহিতকরণ সভার প্রথমটি আয়োজিত হয় ২০১০-এর ১৩ মে পিরোজপুর সার্কিট হাউসে। সেখানে পিরোজপুর, ঝালকাঠি ও বাগেরহাট জেলার ৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত এ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুর রব হাওলাদার। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান নিজেও একাধিক অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পাশাপাশি মন্ত্রীসভার সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, মন্ত্রীপরিষদ সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যরা এসব সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মসূচি

মোট ছয়টি কর্মসূচির আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়:

ক্র. নং	কর্মসূচির নাম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১	ঢাকা ও সিলেট মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	১১৫
২	চট্টগ্রাম, রাজশাহী (রংপুরসহ), কুলনা ও বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	১১৫
৩	ঢাকা বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	৩৪৫
৪	রাজশাহী বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	৩৪৫
৫	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের উপজেলা পযায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	৩৪৫
৬	খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	৩৪৫
	মোট	১৬১০

এসব অবহিতকরণ সভায় আগত অতিথিবৃন্দ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ যেসব সুপারিশ প্রদান করেন তার মধ্যে আছে:

১। যেসব দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে ঐসব দিন আবশ্যিকভাবে কম্পিউটার ল্যাব সকল সময় খোলা রাখা। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে কম্পিউটার শিক্ষা ক্লাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট মৌলিক ব্যবহারে দক্ষ গড়ে তোলা। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা কার্যক্রম তথা ক্লাশ রুটিনের সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

২। কম্পিউটার ল্যাবটি নিয়মিত ক্লাশ ছুটির পর এবং সরকারি ছুটির দিনে সাইবার ক্যাফে হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। এক বা একাধিক শিক্ষককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে হার্ডঅয়্যার ও ট্রাবলশ্যুটিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রথম পর্যায়ে সকল শিক্ষককে মৌলিক তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতায় দক্ষ করে তোলা যাতে সকল শিক্ষকই এই ল্যাবের দায়িত্ব নিতে পারে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ সংশি-ষ্ট জেলা সদরে আয়োজন করা হলে প্রশিক্ষণার্থীদের উপকৃত হবে।

৪। শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা যেতে পারে।

৫। তৈরিকৃত ল্যাবগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইন্টারনেটের বিল পরিশোধের জন্য পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৬। সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেন ওয়েব সাইট তৈরি করার জন্য নির্দেশসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো একটি সার্ভারে তা হোস্ট করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৭। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ওয়েবসাইট এবং কনটেন্ট তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করা।

৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তৈরিকৃত ল্যাবগুলোতে কম্পিউটার ব্যবহার এবং শিক্ষার প্রসার নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা।

এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রশংসাধন্য এ প্রকল্পটিকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেয়া হবে এটাই প্রত্যাশা। ■